# [redacted]

[redacted]

মতো হতেন অথবা নজরুলের মতো। তবে কমরেড মোজাফফর আহমেদ কিংবা মনি সিং হতে পারতেন না, কারণ এরা ছিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট। এদের সহযাত্রীরা ছিলেন লেখাপড়া জানা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত।

দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, ফকির লালন ছিলেন উনিশ শতকের পোড়-খাওয়া, লড়াকু মানুষ। মজলুম জননেতা ভাসানীর মতো লালনের লড়াই ছিল জমিদারতন্ত্র, নীলকর সাহেব, ধন-বৈষম্য, জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও শোষণ-বঞ্চণার বিরুদ্ধে। লালন ও ভাসানী দুজনেই ছিলেন সাদামাটা মানুষ। আচার-আচরণ, চাল-চলন, বেশভূষা, মুখের ভাষা সবদিক দিয়েই তাঁরা ছিলেন একেবারে সাধারণ মানুষ। যে-পারিবারিক পরিমণ্ডলে তাঁরা জন্মেছিলেন, তাতে ওই রকম সাদামাটা, সরল-সহজ হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। বরং না-হওয়াই ছিল অস্বাভাবিক। সিরাজগঞ্জের ধানগড়া গ্রামের এক কৃষক পরিবারে ভাসানীর জন্ম। শৈশবে বাবা-মাকে হারিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার পর্ব চুকে যায়। যে-বালক খুব অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ হয়, তিনি বড় হয়ে গভর্নর-মুখ্যমন্ত্রী-মন্ত্রী হবেন এমনটা আশা করা যায়! যায় না। ভাসানীও তেমন কিছু হননি বা হবার সুযোগ থাকলেও হতে চাননি। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করলেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি। ভাসানীর মতো লালনেরও কেউ ছিল না, বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের গল্পটা ছিল খুবই সাদামাটা, খুবই আটপৌরে। সেই গল্পের ভেতর কোনো জৌলুশ বা চাকচিক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপরও তিনি আমাদের লোকায়ত ইতিহাসের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। লালন এবং ভাসানী অতি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও দুজনেই অনেক বড়মাপের মানুষ হয়েছিলেন। অসাধারণ রকমের বড়মাপের মানুষ হয়েও আত্মম্ভরিতা, অহমিকা কিংবা উচ্চমন্যতায় ভোগেননি। আমৃত্যু মিশে থেকেছেন দীনহীন, নিঃস্ব, রিক্ত মানুষের সঙ্গে।

লালনের কালে কোনো দলীয় রাজনীতি ছিল না। তাঁর জীবৎকালে অক্টাভিয়ান হিউমের পৃষ্ঠপোষকতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও এর শাখা-প্রশাখা তখনও গ্রাম-গঞ্জে বিস্তৃত হয়নি। রাজনীতি থাকলে তিনি হয়তো রাজনীতিতে হতেন। ইতিহাসকে বদলাতে চাইতেন—চাইতেন স্বাধীনতা ও মুক্তি। চাইতেন স্বশাসিত শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সমাজ। তিনিও ক্ষমতা চাইতেন আর পাঁচজন সংগ্রামী-জননায়কের মতো। কিন্তু সেটা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নয়। ক্ষমতা চাইতেন জাতপাত, শোষণ-বঞ্চণার অবসান ও সর্বজনের কল্যাণের জন্য। ক্ষমতা চাইতেন ধর্মের নামে মানুষ ঠকানোর ব্যবসা রুখে দেওয়ার জন্য। মানুষকে গভীরভাবে ভালবাসতেন বলেই তিনি রাজনীতি করতেন,

সেখানে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান প্রাধান্য পেত না। অন্যায়-অবিচার, বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন। প্রতিতুলনা না-করেও বলা যায়, লালন ও ভাসানী দুজনেই ছিলেন সর্বতোভাবে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী জননায়ক। লালনের লড়াই ছিল প্রচলিত সমাজের অন্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে, বিদ্যাসাগরও লড়াই করেছেন। লালনের সমকালীন রাজা রামমোহনও সমাজ বদলের জন্য লড়াই করেছেন, তবে তা ছিল কলকাতা মহানগরের মধ্যেই পরিসীমিত। তাঁর লড়াইয়ের সহযোদ্ধারা ছিলেন কলকাতার সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত এলিটরা। ভাসানীর মতো মুজিবও লড়েছেন রাষ্ট্রযন্ত্র ও আধ্যিপত্যবাদী শক্তির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। মওলানা ভাসানী রাজনীতি করেছেন সমাজতান্ত্রিক ধারায় শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে, আর মুজিবের রাজনীতি ছিল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারায় কল্যাণমূলক ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। একাত্তরে দুজনেই ছিলেন দেশদ্রোহী।

মুজিব ছিলেন সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে পাকিস্তানিরা তাঁকে হত্যা না করলেও স্বাধীন দেশে তিনি নিহত হয়েছেন। ভাসানী প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হননি, কিন্তু বারবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কলঙ্ক-অপবাদ নিতে হয়েছে। আসলে রাষ্ট্র কোন বিমূর্ত ধারণা নয়; কিংবা ধূলির ধরণীতে ঈশ্বরের জয়যাত্রাও নয়। এটা ক্ষমতাধর ও শক্তিমানদের স্বার্থরক্ষারী বৃহৎ মানবীয়-প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মতো প্রচলিত সমাজও প্রাধান্যশালী শ্রেণি বা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার কাজে লিপ্ত থাকে। ‘সমাজ’ চায় ধর্মের অনুশাসন, সংস্কার, প্রথা-পার্বণ, জাতপাতের দোহাই দিয়ে দুর্বলের উপর নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়ে যেতে। রাষ্ট্র বা সমাজের কর্তারা বেশ নিষ্ঠুর ও নির্মম। তারা খুন-খারাবি, চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন-ধর্ষণ সহ্য করে, কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের প্রথা, বিধি-বিধান ও অনুশাসনের বিরুদ্ধাচারণকারীকে ক্ষমা করে না। এ কারণে লালন, ভাসানী, মুজিবকে রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ক্ষমা করেনি। একাত্তরে ওসমানি, জিয়া, তাহেররাও দেশদ্রোহী ছিলেন, পাকিস্তান টিকে থাকলে তারাও ক্ষমা পেতেন না।

বিরূপ পরিবেশে বসবাস করেও লালন ও ভাসানী স্বপ্ন দেখেছেন এবং মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। লালনকে চলতে হয়েছে প্রতিহিংসাপরায়ণ, জাতপাত-কবলিত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে, আর ভাসানীকে রাজনীতি করতে হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির হুমকি-ধামকি আর পরোয়ানার বিরুদ্ধে লড়াই করে। রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে তিনি অরবিন্দের মতো সিদ্ধপুরুষের জীবন বেছে নেননি। তাঁর রাজনীতি,

লড়াই-সংগ্রাম আর অধ্যাত্মচর্চা ছিল একইসূত্রে গাঁথা। লালনের অধ্যাত্মচর্চার মধ্যেও সমাজবিচ্ছিন্নতা ছিল না। তিনিও সমাজে মানুষের ওপর মানুষের নিপীড়নের অবসান চেয়ে লড়াই করেছেন।

লালনের সমকালে অবিভক্ত বঙ্গদেশের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন প্রান্তিক কৃষক ও রায়ত। তাদের ওপর জমিদার ও সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার ছিল। কৃষকদের শত্রু যে জমিদার, মহাজন ও নীলকর সাহেবরা কেমন তা তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ছিলেন জমিদার ও নীলকরবিরোধী। ঠাকুর এস্টেটের জমিদারদের বিরুদ্ধে কাঙাল হরিনাথের সাথে একজোট হয়ে তিনি ও তাঁর শিষ্যরা লড়াই করেছেন। নিঃস্ব রিক্ত, দীনহীন মানুষের কাছাকাছি থেকে তিনি বুঝেছেন যে, গরিব মানুষের শত্রু কেবল বিদেশী বণিক আর রাজপুরুষরাই নন, ইংরেজদের অনুকম্পাপ্রাপ্ত দেশি জমিদার-মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগী বাবুরাও তাদের শত্রু।

ব্রিটিশ আমলে বঙ্গদেশ ছিল সাতসমুদ্র পারের সাদাচামড়ার রাজপুরুষদের অধীনে, তাদের সহযোগীরা ছিল দেশি জমিদার, সুদখোর মহাজন, মোল্লা-পুরুত আর রক্তচোষা চাঁড়াল নীলকর সাহেবরা। এজন্য লালন একই সঙ্গে ছিলেন সামন্তবাদ, নীলকর ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী। ছিলেন সম্প্রদায়-ঊর্ধ্ব অখণ্ডদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ-মানুষ। কোনো সম্প্রদায়-গোত্র, মাজহাব বা মোকামের ঘেরটোপে নিজেকে আটকে রাখতে চাননি। ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে সমাজটা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাক, এটা তিনি চাননি। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চণার অবসানে হিন্দু-মুসলমানকে তিনি এক শামিয়ানার নিচে এনে পঙক্তি ভোজন করিয়েছেন। ভেদবুদ্ধিমুক্ত শোষণহীন সমাজ কায়েম করাই ছিল তার আরাধ্য। তিনি বলেছেন: ‘এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে,/ যেদিন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতিগোত্র নাহি রবে।’ গানের মাধ্যমে তিনি আসলে জাতিগোত্রহীন, সমতাভিত্তিক সমাজের ভাবকল্পই সারা জীবন প্রচার করে গেছেন। শোকে-সুখে, হর্ষ-বিষাদে বাংলার কৃষকসমাজ যেমন শিরদাঁড়া টানটান করে মাটিলগ্ন হয়ে থাকে, লালনও তেমনই নিজের মাটি ও মানুষকে ছেড়ে আকাশবিহারী হতে চাননি। লালনের মতো মওলানা ভাসানীও ছিলেন মৃত্তিকালগ্ন সংগ্রামী পুরুষ। দীন-দরিদ্র মানুষকে ভালবেসে কৃষক সমাজকে নিয়ে সারাজীবন পরাক্রান্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। বক্তৃতামঞ্চ থেকে জালিম ও জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুম হয়ে আগুন ঝরিয়েছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন, কিন্তু সর্বত্রই তিনি তার প্রতিবাদী-কৃপাণ শাণিত করেছেন জুলুমবাজদের বিরুদ্ধে। ছিলেন অগ্রসর চিন্তার মানুষ,

অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে দল ভেঙেছেন, নতুন দল ‘ন্যাপ’ গড়েছেন, তবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি কখনোই। লালনও ছিলেন তাই, তিনিও চেয়েছেন মানবমুক্তির নহবত শুনিয়ে সমাজের ভেদাভেদ ঘোঁচাতে।

লালন ও ভাসানী দু জনেই ছিলেন অধ্যত্মসাধক। একজন লোকায়ত ধারার মরমি ফকির, আরেকজন ইসলামি-সুফি প্রবর্তনার পির। দু জনই এসেছিলেন ধর্মীয় পরিমণ্ডল থেকে, লালনের শিক্ষা আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশ তথা লোকায়ত অধ্যাত্মসাধকদের কাছ থেকে। ভাসানীর শিক্ষা মাদ্রাসা- মক্তব ও কামেল পির-মুর্শিদদের কাছে। লালনের ছিল শত শত শিষ্য-চ্যালা, যারা অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব-রিক্ত, সামাজিকভাবে অপাঙক্তেয়। ভাসানীরও ছিল লক্ষ লক্ষ মুরিদ, তাদের অধিকাংশই ছিল শোষিত-বঞ্চিত-ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ। দুজনেই অধ্যাত্মসাধক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন, কিন্তু লড়াইয়ের ময়দান থেকে চুল পরিমাণ পিছু হটেননি। হাল আমলে বেঁচে থাকলে, ফকির লালনও পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী লড়াইয়ে সামনের কাতারের সেনানী হিসেবে সামিল হতেন। তিনিও শোষণহীন-মানবিক সমাজ কায়েমের লড়াইয়ে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট কিংবা র্যাডিক্যাল বামপন্থীদের সহগামী হতেন। ভাসানীর মতো হয়তো-বা তাকেও জেলে যেতে হত কিংবা জেলে বসে অনশন-ধর্মঘট করতে হত।

লালন বেঁচে থাকলে জিন্নাহ-গান্ধীর ধারার রাজনীতি করতেন না বা করতে পারতেন না। তাঁর পূর্বসূরি হতেন সুভাষ বসু যিনি ছিলেন মনেপ্রাণে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি। পাকিস্তানি জাানায় বেঁচে থাকলে জিন্নাহর চালবাজির রাজনীতি লালন মানতে পারতেন না, যেমন পারেননি ভাসানী। গান্ধীর সঙ্গে খানিকটা মিল থাকলেও তাঁর ধর্মীয় আবরণে মোড়ানো রাজনীতিও লালনের কাছে গ্রহণযোগ্য হত না। গান্ধী অহিংসবাদী হলেও অর্থনৈতিক সমতায় বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু লালন ও ভাসানী দু জনেই সমতাভিত্তিক সমাজ-দর্শনে বিশ্বাস করতেন। জিন্নাহর মতো গান্ধীও ছিলেন সমাজের উঁচুতলার মানুষ। গরিবানা হালে, দীনদরিদ্র বেশে ঘোরাফেরা করলেও গান্ধীর পেছনে কংগ্রেস ও ভারতের জাতীয়তাবাদী অভিজাতদের যে প্রচুর খরচ হত সেটা আর কোনো গোপন ব্যাপার নয়। সাজপোশাকে, ফ্যাশান-স্টাইলে, বক্তৃতার ভাষাভঙ্গিতে হেরফের থাকলেও গান্ধী ও জিন্নাহ দুজনেই ছিলেন বড়লোকদেও নেতা। লালন ও ভাসানী দু জনেই ছিলেন নিচুতলার মানুষ ও খাঁটি বাঙালি। তারা নিজের মতো করে জীবনযাপন করে গেছেন। দুজনেই গরিব-দুঃখী, নিঃস্ব-রিক্ত তথা ব্রাত্যজনকে ক্ষমতায়িত করতে চেয়েছেন। লালন যে ভাসানীর মতো আপসহীনভাবে কৃষক-শ্রমিক তথা আমজনতার সামগ্রিক

মুক্তির জন্য কাজ করে যেতেন তা বলাই বাহুল্য।

লালন ও ভাসানী দুজনেই মুক্তিপিয়াসি সংগ্রামী পুরুষ, কিন্তু তাদের সংগ্রামের কাফেলা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত বিজয়ের শীর্ষবিন্দু ছুঁতে পারেনি, দেখে যেতে পারেননি রোদ-ঝলমলে মানবিক সমাজ । সুনির্দিষ্ট কোনো সাংগাঠনিক-পরিকাঠামো বা ব্যবস্থাপনাও রেখে যেতে পারেননি আগামী প্রজন্মের জন্য। তবে দুজনের মধ্যেই মানবমুক্তির স্বপ্ন ছিল। উঁচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফের ভেদ ঘুঁচিয়ে জাতকূল-গোত্রহীন মুক্ত-মানবসমাজের বলে গেছেন লালন। তবে লালন-দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে-উচ্চায়ত চিন্তার মানুষ বা শিষ্যবর্গ প্রয়োজন ছিল সেটা লালন ও তার সাক্ষাৎ শিষ্যরা বানাতে পারেননি। লালন-উত্তর দুদ্দু শাহ, মনিরুদ্দীন শাহ, বেহাল শাহ, শুকচাঁদ ফকির, অমূল্য গোঁসাই, মহেন্দ্র ক্ষ্যাপারা আসর-মাতানো গায়ক ছিলেন, কিন্তু লালনীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের উদ্বুদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করার মতো মনস্তাত্ত্বিক ও সাংগাঠনিক শক্তি ছিল না। ভাসানীও বুঝেছিলেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি সমতাভিত্তিক স্বাধীন ভূখণ্ড প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর মুরিদ ও অনুসারীরা ভাসানীর লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করতে পারেননি। যদি পারতেন তাহলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের রূপ-চেহারা, রাজনীতির চালচিত্র অন্য রকম হতে পারত। ভাসানী ও লালনকে নিয়ে বিতর্ক আছে, আগামীতেও থাকবে, তারপরও দুজন জনমানস ও পরিসরে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবেন। যে কারণে রুমি-রবীন্দ্রনাথ, গালিব-ইকবাল থেকে নজরুল-সুকান্ত বেঁচে থাকবেন, ওই একই কারণে লালন ও ভাসানী মানব মুক্তির সুহৃদ-সারথি, গাইড-ফিলোসফার হিসেবে বেঁচে থাকবেন।

লেখক: অধ্যক্ষ (ভা.), মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। ফোন: ০১৮১৬-৬৯৩৪